# কুচিয়া চাষ ব্যবস্থাপনা

## চাষী সহায়িকা

প্রকাশনায় ও প্রচারে
ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
কলেজপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়
Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)


পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

**প্রকাশনায়**

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশন ইউনিট
কলেজপাড়া, ঠাকুরগাঁও
মোবাইলঃ ০১৭৩৩-২০৯২৩৩
ই-মেইলঃ aynul_esdo@yahoo.com
ওয়েবসাইট ঃ www.esdo.net.bd

**প্রকাশকাল**

মে ২০১৯

**প্রকাশনা উপদেশক**

জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৩, পিকেএসএফ
ড. শরীফ আহম্মেদ চৌধূরী, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ

**সার্বিক তত্ত্বাবধানে**

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

**রচনা, সংকলন ও সম্পাদনায়**

এ. এম. ফরহাদুজ্জামান, উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ

**সহযোগিতায়**

মোঃ আইনুল হক, এপিসি, ইএসডিও
মোঃ হারুন অর রশিদ, মৎস্য কর্মকর্তা, ইএসডিও
মোঃ নাদিমুল ইসলাম, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, ইএসডিও

**অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়**

Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি,
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

**অর্থায়নকারী উদ্যোগের নাম**

প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি


**তথ্যসূত্রঃ**


১. পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে মাঠ পর্যায়ে সহযোগী সংস্থা সমূহ কর্তৃক কুচিয়া চাষ প্রদর্শনীর ফলাফল, অভিজ্ঞতা ও শিখনসমূহ

২. বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

HATIL

**ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান,** নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

# মুখবন্ধ

ঠাকুরগাঁও জেলার কয়েকজন উদ্যমী যুবকের একতাবদ্ধ প্রয়াসে ১৯৮৮ সালে গড়ে উঠে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) প্রতিষ্ঠাকাল হতেই শান্তি সমৃদ্ধময় সমাজ গঠনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি নদীমাতৃক উন্নয়নশীল দেশ। আই পি সি সি'র মতে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ক্ষুদ্র দেশ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে জড়িত বিষয়গুলোতে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন: ঘূর্ণিঝড় (সাইক্লোন), বর্জ্রপাত, বন্যা ইত্যাদির পাশাপাশি বিপত্তি হিসেবে রয়েছে (খরা, অনাবৃষ্টি) অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, জলাবদ্ধতা, উষ্ণ তাপমাত্রা ইত্যাদি। এ সব প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন এখানকার অন্তরায় কৃষিজ নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি সম্ভাবনাও রয়েছে প্রচুর। একদিকে, এই জেলার অধিকাংশ মানুষের জীবিকা মাছ চাষের সাথে জড়িত। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান মাছের ক্ষেত্রে অত্র অঞ্চলে আদিবাসী ও সনাতন ধর্মাবলম্বী লোক সংখ্যার বিশাল একটি অংশ কুচিয়া মাছ চাষের এবং আহরণের সাথে সম্পৃক্ত। আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং সনাতন ধর্মাবলীর লোকজনের নিকট কুচিয়া মাছ বেশ জনপ্রিয়। আদিবাসী ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ কুচিয়া আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। কুচিয়া বাংলাদেশ সহ পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, কোরিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়ায় ও পাওয়া যায়। বাজার দর ভালো হওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে কুচিয়া জাপান, কোরিয়া, হংকং , থাইল্যান্ড, চীন , তাইওয়ান সহ প্রভৃতি ১৫টি দেশে রপ্তানী হচ্ছে। চিংড়ী এবং কাঁকড়ার মতো কুচিয়ারও বিশাল রপ্তানী বাজার ও সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ব্যবসায়ীদের নিকট কুচিয়া একটি সম্ভাবনাময়ী রপ্তানী পণ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক উৎস থেকেই প্রাপ্ত কুচিয়াই মূলত বিদেশে রপ্তানী করা হয়। এক সময় দেশে সর্বত্র কুচিয়া পাওয়া গেলেও বিভিন্ন কারণে কুচিয়ার আবাসস্থল নষ্ট হওয়ায় এবং প্রাকৃতিক উৎস থেকে নির্বিচারে অতি আহরণ করার ফলে কুচিয়ার পরিমাণ আশংকাজনক হারে কমে যাচ্ছে। তাই কুচিয়া চাষের কোন বিকল্প নেই।

# সূচিপত্র


কুচিয়া পরিচিতি ০৮

কুচিয়া চাষের সুবিধাসমূহ, অর্থনৈতিক গুরুত্ব, পুষ্টিমান ও ঔষধি গুণ ০৯

কুচিয়া চাষের পটভূমি ১০

বাংলাদেশে কুচিয়া চাষের সম্ভাবনা ১০-১১

স্ত্রী ও পুরুষ কুচিয়া চেনার উপায় ১১

কুচিয়া চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা ১২

একুয়াকালচার/ডিচ পদ্ধতিতে কুচিয়ার আবাসস্থল নির্মাণ পদ্ধতি ১২-১৩

কুচিয়ার ডিচ তৈরীর পদ্ধতি ১৩-১৫

কুচিয়ার খাবার সম্পর্কিত তথ্য ১৫

কুচিয়ার প্রাকৃতিক প্রজনন সম্পর্কিত তথ্য ১৬

কুচিয়ার পোনা মজুদ ও মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ১৬-১৭

কুচিয়ার ডিম ও লার্ভি ব্যবস্থাপনা এবং ময়না উৎপাদন কৌশল ১৮-১৯

কুচিয়া চাষে আয়-ব্যয়ের হিসাব ২০-২১

কুচিয়ার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ২২

কুচিয়া শুটকিকরণ কৌশল বা কুচিয়া সংরক্ষণ পদ্ধতি ২৩-২৬

উপসংহার ২৭

# চাষী সহায়িকাটির উদ্দেশ্য

১ কুচিয়া মাছ কি সে সম্পর্কে চাষীরা বলতে পারবেন।

২ কুচিয়া পরিচিতি, কুচিয়ার গুণাগুণ ও কুচিয়া চাষের সুবিধাসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৩ কুচিয়া চাষের পটভূমি ও কুচিয়া মাছের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৪ কুচিয়া মাছ চাষের মজুদপূর্ব বিভিন্ন ধাপ বা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৫ কুচিয়ার খাবার ও প্রজননকাল সর্ম্পকে বলতে পারবেন।

৬ স্ত্রী ও পুরুষ কুচিয়া সনাক্তকরণ কৌশল সর্ম্পকে বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৭ কুচিয়ার প্রাকৃতিক প্রজনন ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে জানতে ও বলতে পারবেন।

৮ কুচিয়ার চাষ পদ্ধতি (একুয়াকালচার/ডিচ পদ্ধতি) সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৯ একুয়াকালচার পদ্ধতিতে কুচিয়া চাষে পোনা মজুদ, মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে বলতে পারবেন।

১০ একুয়াকালচার/ডিচ পদ্ধতিতে কুচিয়া চাষে আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্ম্পকে বলতে পারবেন।

১১ ভার্মি কম্পোষ্ট সার তৈরির কৌশল শিখতে ও জানতে পারবেন।

১২ কুচিয়ার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১৩ কুচিয়া মাছ চাষে বিভিন্ন ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

১৪ ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

১৫ কুচিয়া মাছ আহরণ, সংরক্ষণ/শুটকীকরণ ও পুনঃমজুদ কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

# কুচিয়া কি

কুচিয়া এক ধরনের মসৃণ ত্বক বিশিষ্ট পিচ্ছিল ও আইশবিহীন, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু মাছ। সাধারণত শ্বাস-প্রশ্বাস পদ্ধতির ভিত্তিতে দুই ধরনের কুচিয়া পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি পানি থেকে ( Anguilla) এবং অন্যটি বায়ু থেকে (Monopterus) শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। এশিয়াতে ছয় প্রজাতির কুচিয়া আছে, যার মধ্যে চারটি প্রজাতিই বাংলাদেশে পাওয়া যায়, যেমন-Monopterus cuchia, Anguilla bengalensis, Pisodonoghis boro ও P. camcrivorus । বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে Monopterus cuchia জাপান, কোরিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, চীন, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশে রপ্তানী করা হচ্ছে। চিংড়ি এবং কাঁকড়ার মতো কুচিয়ার ও বিশাল রপ্তানী বাজার ও সম্ভাবনা রয়েছে। কুচিয়া বাংলাদেশে একটি নতুন রপ্তানীযোগ্য পণ্য। প্রাকৃতিক উৎস্য থেকেই আহরিত কুচিয়া মূলত রপ্তানী করা হয়। মৎস্য পণ্য ব্যবসায়ীদের নিকট কুচিয়া একটি সম্ভাবনাময় রপ্তানী পণ্য হিসেবে বর্তমানে ব্যাপকভাবে বিবেচিত হচ্ছে।

## প্রাণিজগতে কুচিয়ার অবস্থান

| | |
|---|---|
| Kingdom | Animalia |
| Phylum | Chordata |
| Sub-phylum | Vertebrata |
| Class | Osteichthyes |
| Order | Synbranchiformes |
| Family | Synbranchidae |
| Genus | Monopterus |
| Species | M. cuchia |

# স্বাদু পানির কুচিয়ার বিস্তৃতি ও বাসস্থান

আমাদের দেশে সাধারণত দুই ধরনের কুচিয়া পাওয়া যায়। একটা স্বাদু পানির কুচিয়া এবং অন্যটি লবণাক্ত পানির কুচিয়া। Monopterus cuchia হলো স্বাদু পানির কুচিয়ার একটি প্রজাতি যা সাধারণত কাদায় কিংবা জলাধারে থাকে। এই মাছটি প্রাকৃতিকভাবে অগভীর উন্মুক্ত জলাশয়ে যেমন হাওড়, বাওড়, বিল, খাল, প্লাবনভূমি, পুকুর, ঘের ছাড়াও ধানক্ষেতের আইল, জলজ ঝোপঝাড়যুক্ত এলাকায় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে কুচিয়া মাছ কাদার গর্তে, অগভীর বিলে এবং ধানক্ষেতে প্রায়শই পাওয়া যায়। স্বাদু পানির কুচিয়া কম অক্সিজেন, বেশী তাপমাত্রা, কম গভীর পানিতে এমনকি দূষিত পানিতেও বেঁচে থাকতে পারে। মাছ, শামুক, জলজ পোকা, অমেরুদন্ডী প্রাণি, কেঁচো ইত্যাদি এই মাছের প্রাকৃতিক খাবার। দেশে শুধুমাত্র আদিবাসী জনগোষ্ঠী এই মাছটি খেয়ে থাকে, তবুও রপ্তানী চাহিদার কারণে এর যথেষ্ট বাণিজ্যিক গুরুত্ব রয়েছে। এর বাজার দর অনেক বেশী তাই নাতিশীতোষ্ণ ও গ্রীষ্মমন্ড লীয় প্রজাতি হিসেবে এই প্রজাতির কুচিয়া ব্যাপকভাবে বাংলাদেশসহ পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, কোরিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় পাওয়া যায়।

## কুচিয়া চাষের সুবিধাসমূহ

১. কুচিয়া কষ্টসহিষ্ণু মাছ যা অধিক মজুদ ঘনত্বে পুকুর, হাপা, চৌবাচ্চা, ডিচে চাষ করা যায়।
২. কম অক্সিজেন যুক্ত পানিতে বা জলাশয়ের প্রতিকূল পরিবেশে কুচিয়া টিকে থাকতে পারে।
৩. জীবিত অবস্থায় কুচিয়া বাজারজাত করা যায়।
৪. কুচিয়া রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যেতে পারে।
৫. গ্রামীণ মহিলারা সহজেই পুকুর/হাপা/চৌবাচ্চা/ডিচে কুচিয়া চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে।

## কুচিয়ার খাদ্যমান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

১. কুচিয়া মাছ একটি চমৎকার খাদ্যমান সম্পন্ন পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবার।
২. এতে উচ্চ মানসম্পন্ন প্রোটিন পাওয়া যায়।
৩. প্রতি ১০০ গ্রাম কুচিয়ায় প্রায় ১৪ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া য়ায়।
৪. ১০০ গ্রাম কুচিয়া থেকে প্রায় ৩০৩ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়, যেখানে অন্যান্য সাধারণ মাছ হতে পাওয়া যায় মাত্র ১১০ কিলোক্যালরি।

## কুচিয়ার পুষ্টিমান ও ঔষধি গুণ

কুচিয়ার মধ্যে রয়েছে অধিক পরিমাণ প্রোটিন এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, যার বহু উপকারিতা রয়েছে, যেমন-

১. হার্টের করোনারী রোগ প্রতিরোধ করে।
২. মেধা শক্তির উন্নয়ন সাধন করে।
৩. চর্ম রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।
৪. উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন দুর করে।
৫. ক্যানসার ও কিডনি রোগ উপশমে সাহায্য করে।
৬. চোখের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

## কুচিয়া চাষের পটভূমি

এক সময় বাংলাদেশের সর্বত্র কুচিয়ার প্রাপ্যতা ছিল। বাংলাদেশ ছাড়া পাকিস্তান, নেপাল ও ভারতে এ প্রজাতির মাছের বিস্তৃতি রয়েছে। সিলেট, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার অগভীর বিল ও বোরো ধান ক্ষেতের আইলে, জলজ আগাছার ঝোপ-ঝাড়ে পরিপূর্ণ পরিবেশে কুচিয়া পাওয়া যেতো। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের জলাভূমিগুলোর জীববৈচিত্র্য, ইকোসিস্টেম, পানি প্রবাহ ইত্যাদি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। প্রকৃতি থেকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে কুচিয়া সংগ্রহ এবং প্রাকৃতিক (অধিক খরা ও উজান থেকে নদীপথে আসা পলি দিয়ে জলাভূমি ভরাট) ও মনুষ্যসৃষ্ট (অপরিকল্পিত ড্রেইন, সুইচ গেইট ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, জলাভূমি কৃষিতে স্থানান্তর, নিষিদ্ধ ঘোষিত মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ও সার ব্যবহার এবং শিল্প-কারখানার বর্জ্য ইত্যাদি) কারণে এদের আবাসস্থল ধ্বংস হচ্ছে। বর্তমানে এর প্রাপ্যতাও অপ্রতুল। তাই কুচিয়া আজ বিপন্ন (IUCN ২০০০)। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিকারীগণ দেশের বিভিন্ন এলাকায় কুচিয়া শিকার করে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে। আহরিত কুচিয়া মাছ দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হয়। কুচিয়ার চাষ পদ্ধতি, খাদ্যাভাস, প্রজনন কৌশলসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা সহজতর নয় এবং প্রকৃতি থেকে কুচিয়া আহরণ পদ্ধতিও একটি জটিল প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় অনেক ছোট পুকুর ও জলাশয়, ধানক্ষেত রয়েছে যা আজও মৎস্য চাষের আওতায় আসেনি। এ সমস্ত জলাভূমিতে যথাক্রমে চাষ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটিয়ে কুচিয়ার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা জরুরী। এ ধরনের প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের খাদ্য নিরাপত্তায় সরাসরি ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব। আদিবাসী সমাজ ছাড়াও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই কুচিয়া খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। আদিবাসী সমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কুচিয়ার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং এর চাষ ব্যবস্থাপনা একটি সফল পদক্ষেপ।

## কুচিয়া চাষে বিশ্ব সম্প্রদায়

বাংলাদেশে কুচিয়া চাষ নতুন হলেও এশিয়ার কিছু দেশ যেমন চীন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ভিয়েতনামে এর প্রচলন বেশ প্রাচীন। এশিয়ার অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশ কুচিয়া চাষের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ প্রতিযোগিতামূলকভাবে কুচিয়া চাষে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। এদের অধিকাংশই কুচিয়া চাষ করে মূলতঃ আন্তর্জাতিক রপ্তানী বাণিজ্যে ও নিজেদের চাহিদা মিটানোর জন্য।

## বাংলাদেশে কুচিয়া চাষের সম্ভাবনা

বাণিজ্যিকভাবে কুচিয়া উৎপাদনকে বাংলাদেশে ১৯৭৭ সালে সর্বপ্রথম জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরীক্ষামূলকভাবে খাঁচায় কুচিয়া মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সীমিত পরিসরে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলত গবেষণা ও স্নাতক ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে। বাংলাদেশে কুচিয়া চাষের বিশেষ কিছু দিক তুলে ধরা হলো-

১. ২০০৬-০৭ সালে মৎস্য অধিদপ্তর ও World Fish Center এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে শেরপুর জেলার ঝিনাইগাহিতে প্রাকৃতিক জলজ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে কুচিয়া চাষ শুরু হয়।

২. চাষের জন্য পোনার অভাব কুচিয়া চাষে অন্যতম বড় বাধা। যেহেতু কুচিয়া মাছের ডিমের সংখ্যা খুবই কম; সেহেতু কৃত্রিম প্রজননে পোনার যে প্রাপ্তি পাওয়া যাবে তা দিয়ে চাষেরপোনার প্রাপ্যতা মিটানো সম্ভব নয়। প্রকৃতি থেকে পোনা সংগ্রহ করা খুবই কষ্টসাধ্য। তাই, প্রাকৃতিক প্রজননের উপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং প্রাকৃতিক প্রজনন কিভাবে সহজতর করা যায় সে ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৩. বাংলাদেশে যেহেতু কুচিয়া মাছ চাষের প্রচলন নেই সেহেতু এর খাবারের উপর তেমন কোন তথ্য নেই। কুচিয়া মাছের চাষ ও তার খাদ্যভ্যাসের সাথে তাল মিলিয়ে উপযোগি সম্পূরক খাবার তৈরি করতে হবে। তবে উক্ত পিলেট জাতীয় খাবারে অবশ্যই ৪০% আমিষের পরিমাণ থাকা আবশ্যক।

৪. আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সীমাবদ্ধতার মাঝেও যে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করা হয়েছে তা চাহিদার তুলনায় ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ কুচিয়া চাষ পদ্ধতির অনেক উন্নতি সাধন করেছে। স্বাদু পানিতে খাঁচায় ও ধানক্ষেতে চাষ করা হচ্ছে; সেখানে আমাদের দেশে বাণিজ্যিকভাবে কুচিয়া চাষের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পরিবেশ ও সময়ের সাথে সংগতিপূর্ণ উপযোগী চাষ পদ্ধতি ও যথাযথ কারিগরী দিকনির্দেশনার অভাবে কুচিয়া চাষ জনপ্রিয় হওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়েছিলো। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিশারীজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাকৃবি, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং অন্যান্য দু'একটি নেতৃস্থানীয়প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় কুচিয়া চাষের অগ্রগতি এখন দৃশ্যমান।

## চাষীরা স্ত্রী ও পুরুষ কুচিয়া কিভাবে চিনবেন?

পুরুষ ও স্ত্রী কুচিয়া সনাক্ত করা অত্যন্ত দুরুহ। কিন্তু কিছু কিছু বাহ্যিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য এদেরকে পৃথক করতে সহায়তা করে। এটা সুনিশ্চিত যে, পরিপক্ক পুরুষ কুচিয়া স্ত্রী কুচিয়া অপেক্ষা আকারে বড় হয়। স্ত্রী কুচিয়ার দেহের তলদেশ (Abdomen) ফুলে থাকে এবং হলদে-বাদামী রং ধারণ করে। দেহের তলদেশের চামড়া খসখসে হয় এবং পায়ুপথ ও জনন ছিদ্র পথ গোলাকার হয়। পুরুষ কুচিয়ার জনন ছিদ্র পথ নলাকার হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণভাবে স্ত্রী-পুরুষ উভয় কুচিয়ার একটি মাত্র সাদা, মসৃণ সুচাকৃতির গোনাড থাকে। গোনাডটি লম্বালম্বিভাবে পৌষ্টিক নালীর নিচে এবং কিডনির উপরে তলপেটের গহ্বরের সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে থাকে। পুরুষ কুচিয়া মাছে লিভার থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত দুইটি সমান সরু পাতলা লম্বাকৃতির স্পার্ম ডাক্ট দেখা যায়। স্ত্রী কুচিয়ার ক্ষেত্রে একটি নলাকার ওভাডাক্ট গলব্লাডারের সম্মুখভাগ থেকে শুরু হয়ে পায়ুপথে উন্মুক্ত হতে দেখা যায়। সফল প্রজননের জন্য পরিপক্কতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্ত্রী কুচিয়ার ক্ষেত্রে হালকা চাপ দিলে হলুদ রংয়ের তরল এবং স্বল্প সংখ্যক ডিমও বের হয় যা পরিপক্কতার নির্দেশক। অন্যদিকে পরিপক্ক পুরুষ কুচিয়ার ক্ষেত্রে তলপেটে হালকা চাপে তরল সাদা মিল্ট বের হয়। এসময় স্ত্রী মাছের জেনিটাল প্যাপিলা গোলাকৃতি ধারণ করে ও ফুলে উঠে এবং পুরুষ কুচিয়ার প্যাপিলা লম্বাকৃতি হয়।

### পুরুষ এবং স্ত্রী কুচিয়া চেনার উপায়

| সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য | পুরুষ কুচিয়া | স্ত্রী কুচিয়া |
|---|---|---|
| পেট | গোলাকার, অপেক্ষকৃত শক্ত | নরম ও গোলাকার |
| পায়ুপথ | সামান্য লম্বা ও লালচে বর্ণের | পায়ু পথ স্ফীত, গোলাকার, মাংসল ও গোলাপী |
| লেজ | ছোট | চ্যাপ্টা |
| রং | শরীরের রং উজ্জ্বল ও বাদামী | শরীরের রং তুলনামূলক ফ্যাকাশে |

পুরুষ কুচিয়ার পায়ুপথ/জেনিট্যাল প্যাপিলা

স্ত্রী কুচিয়ার পায়ুপথ/জেনিট্যাল প্যাপিলা

## কুচিয়া চাষ পদ্ধতি সম্পর্কিত ধারণা

কুচিয়া একটি ইল জাতীয় মাছ যা বাংলাদেশে প্রাকৃতিক জলাশয়ে উৎপাদিত হয়ে থাকে। দেহের আকৃতি ও গর্তে বাস করার স্বভাব এবং সাপের মত দেখতে হওয়ার জন্য দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা কম হলেও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের একটি অংশের নিকট মজাদার খাবার হিসেবে জনপ্রিয়। স্বল্প জনগোষ্ঠীর নিকট এ মাছের চাহিদা প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত পরিমাণের উপরই নির্ভরশীল ছিল। পুষ্টিগুণে উঁচুমানের এ মাছের চাহিদা দেশে কম থাকলেও বিদেশে বেশি থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বিষয়টি সামনে রেখে এ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। লুকিয়ে থাকার স্বভাবের জন্য মাছটির প্রজনন, বৃদ্ধি, খাদ্য ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক তথ্যই আমাদের নিকট অজানা ছিল। তাই এ প্রকল্পের মাধ্যমে মাছটির প্রজননসহ চাষ পদ্ধতি সহজ ও জনগণের নিকট পরিচিত ও সহজতর করার লক্ষ্যে এর চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

## কুচিয়া মাছ চাষের পদ্ধতি

আমাদের দেশে কুচিয়ার উৎপাদন এখনও প্রাকৃতিক উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল, যেখানে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তি প্রয়োগের সুযোগ কম। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি হলো চাষ। তাই কুচিয়ার চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুচিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তিন পদ্ধতিতে চাষ করা যায়।

১
একুয়াকালচার/
ডিচ পদ্ধতি/
প্রাকৃতিক
জলজ পরিবেশ
ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

২
চৌবাচ্চা পদ্ধতি

৩
হাপা পদ্ধতি

### ১. একুয়াকালচার/ডিচ পদ্ধতি/প্রাকৃতিক জলজ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

একুয়াকালচার পদ্ধতির মধ্যে ডিচে চাষ পদ্ধতি উপযোগী বলে বিবেচিত। এটিকে প্রাকৃতিক জলজ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিও বলা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, বালি, ইট ও সিমেন্ট জাতীয় উপকরণে তৈরি চৌবাচ্চা স্বভাবজনিত কারণে এরা সহ্য করতে পারে না। বিশেষ করে পুকুরে মাছের পোনা ছাড়লে কমবেশী পোনা হবে। কিন্তু পুকুরে কুচিয়া ছাড়লে কুচিয়া পাওয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এর বাসস্থান তার প্রাকৃতিক বাসস্থানের মত না হয়। পুকুর থেকে গর্ত করে বা পাড়ের উপর দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কুচিয়ার অধিক। তাই, অধিক নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চাষ করার জন্য মাটির তৈরি ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুর (ডিচ) অধিক নিরাপদ বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

**কুচিয়া চাষে ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুর (ডিচ) তৈরিঃ** নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সতর্কতার সাথে ধাপে ধাপে সম্পন্ন করে লাগসই পদ্ধতিতে তুলনামূলক কম খরচে প্রাকৃতিক প্রজননের ডিচের মত কুচিয়ার বসবাস উপযোগী ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুর তৈরি করা যায়।

**ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুর (ডিচ) নির্মাণের ধাপসমূহঃ**

১. একুয়াকালচার পদ্ধতির মত প্রথমে নির্বাচিত উচু জায়গায় একটি ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুর নির্মাণ করতে হবে। পুকুরের আয়তন দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট ও গভীরতা ৩ ফুট আকারের হতে হবে।

২. ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের (ডিচ) কূলপাড়/বকচরের বাইরের চারদিকে বাঁশের শক্ত খুঁটি পুঁতে বাঁশের ফালি দিয়ে মজবুত করে ২.৫ ফুট উচু বেড়া দিতে হবে। ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের একপাশের বেড়া থেকে অপর পাশ পর্যন্ত প্রথমে মাটিতে পলিথিন বিছিয়ে দিতে হবে। তার উপর ত্রিপল বিছিয়ে দিতে হবে ।

## ডিচে কুচিয়ার জন্য আবাসস্থল তৈরি

১. ত্রিপলের উপর ১ম স্তরে ৬ ইঞ্চি পুরুত্বে ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটি একত্রে মিশিয়ে তলদেশে বিছিয়ে দিতে হবে।

২. ২য় স্তরে চুন, গোবর, কচুরিপানা ও খড় মিশ্রিত কমপোস্ট দিয়ে ৫ ইঞ্চি পুরুত্বের স্তর তৈরি করতে হবে।

৩. ৩য় স্তরে  ৭ দিনের শুকনো কলাপাতা দিয়ে ১ ইঞ্চি পুরু করে ঢেকে দিতে হবে। সর্বশেষ ৪র্থ স্তরটি ৬ ইঞ্চি পুরু হবে এবং এ স্তরে ১ম স্তরের মত ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটি একত্রে মিশিয়ে বিছিয়ে দিতে হবে।

৪. ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের (ডিচ) ভিতরের চারদিকে বেড়া সংলগ্ন পাড়/বকচরটি ১ ফুট পর্যন্ত চওড়া করে ১ ফুট গভীরতায় ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটি মিশিয়ে নির্মাণ করতে হবে।

৫. ত্রিপলের উপর ১ম স্তরে ৬ ইঞ্চি পুরুত্বে ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটি একত্রে মিশিয়ে তলদেশে বিছিয়ে দিতে হবে।

৬. ২য় স্তরে ৩ কেজি ইউরিয়া, ৬ কেজি টিএসপি, ৬ কেজি চুন, ৬০ কেজি গোবর, প্রয়োজনীয় পরিমাণ কচুরিপানা ও খড় দিয়ে স্তরে স্তরে সাজিয়ে কমপোস্ট তৈরি করে ৫ ইঞ্চি পুরুত্বের স্তর তৈরি করতে হবে।

৭. ৩য় স্তরে ০.৭ দিনের শুকনো কলাপাতা দিয়ে ১ ইঞ্চি পুরু করে ঢেকে দিতে হবে। সর্বশেষ ৪র্থ স্তরটি ৬ ইঞ্চি পুরু হবে এবং এ স্তরটি ১ম স্তরের মত ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটি একত্রে মিশিয়ে বিছিয়ে দিতে হবে।

৮. ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের (ডিচ) ভিতরের চারদিকে বেড়া সংলগ্ন কুলপাড়/বকচরটি ১ ফুট পর্যন্ত চওড়া করে ১ ফুট  গভীরতায় ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটির মিশিয়ে নির্মাণ করতে হবে।

৯. চৌবাচ্চার বাহিরের চারদিকে ২.৫ ফুট উচু বাঁশের শক্ত খুঁটি পুঁতে বাঁশের ফালি দিয়ে একটি বেড়া দিতে হবে।

## আবাসস্থল/আশ্রয়স্থল তৈরিতে নিম্নের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে-

১. নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং তাপমাত্রা রোধ করার জন্য বকচর/কুলপাড়ের উপর নারিকেল গাছের পাতা গিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

২. কূলপাড়টি পানির স্তর থেকে সবসময় বেশি উচ্চতায় থাকবে।

৩. পানির স্তর নীচে নেমে গেলে পানি সরবরাহ করতে হবে।

৪. প্রকৃতিতে কুচিয়ার আবাসস্থল ধানক্ষেতের মত ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের (ডিচ) পরিবেশ উপযোগী করতে হবে।

৫. কুচিয়া অবমুক্তির পূর্বে ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুরের (ডিচ) আশ্রয়স্থল হিসেবে জলজ আগাছা ও কচুরিপানা দিতে হবে।

## কুচিয়ার ডিচ তৈরী ধাপসমূহের পদ্ধতি প্রদর্শন/ডিচ নির্মাণ-এর বিভিন্ন ছবি-

ধাপ-১: কুচিয়া চাষের জন্য গর্ত খনন
(২৪ ফুট দৈর্ঘ্য, ১২ ফুট প্রস্থ ও ৩ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট )

ধাপ-২: ডিচের তলদেশে মাপ অনুযায়ী পলিথিন বিছানো

ধাপ-৩: ডিচের চারপাশে মাপ
অনুযায়ী ত্রিপল বিছানো

ধাপ-৪: ডিচের বকচরে মাটি দ্বারা
কুচিয়ার আশ্রয়স্থল তৈরিকরণ

ধাপ-৫: ডিচের তলদেশে কম্পোস্ট সার তৈরীর জন্য
গোবর, খড় ও অন্যান্য উপকরণ স্থাপন

ধাপ-৬: ডিচের চারপাশে নেট দিয়ে
বেড়া দেয়া/ফেন্সিং স্থাপন

ধাপ-৭: কুচিয়া ছাড়ার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতকৃত ডিচ, যা কুচিয়া চাষের জন্য উপযোগী

## হাউজে/চৌবাচ্চায় কুচিয়া চাষঃ (১০ ফুট দৈর্ঘ্য, ৬ ফুট প্রস্থ ও ৩ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট)

## কুচিয়ার খাবার সম্পর্কিত তথ্য

কুচিয়া নিশাচর প্রাণী। রাতে খাবার খেতে এরা স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। কুচিয়া রাক্ষুসে স্বভাবের, প্রাণীজ খাবার খেতে পছন্দ করে। এদের খাদ্য তালিকায় ছোট মাছ, মাছের পোনা, গুতুম মাছ, কেঁচো, শামুক, সিল্ক ওয়ার্ম পিউপি, জলজ কীটপতঙ্গ ইত্যাদি রয়েছে। কুচিয়ার বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক। জীবিত পোনা মাছ, শুটকী মাছের গুড়া, শামুক ও ঝিনুকের মাংস খেতে ভালবাসে। কুচিয়া মাছকে প্রতিদিন শারীরিক ওজনের ৩-৫% খাবার দিতে হয়। পানিযুক্ত ধানক্ষেত থেকে এ্যাপল শামুক সংগ্রহ করে কুচিয়ার খাবার হিসেবে দেয়া যেতে পারে। কুচিয়া মাছের খাবার সরবরাহ নির্ভর করে মাছের মোট ওজন ও তাপমাত্রার ওপর খাবার ট্রে-তে করে সাজিয়ে দিতে হয়। ট্রেটি কাদার উপর পানির নীচে রাখতে হবে। খাবার পরিবেশন এমনভাবে করা উচিত যেন কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত খাবার পানির পরিবেশ দূষিত করতে না পারে। কুচিয়া চাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা কুচিয়ার পোনা প্রাপ্তি। কুচিয়া চাষ প্রচলনে অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সময়মত চাষযোগ্য আকারের পোনা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। কুচিয়ার পোনার উৎস সম্পর্কে জানা ও চাহিদা অনুযায়ী পোনা প্রাপ্তির লক্ষ্যে কুচিয়ার প্রজনন সম্পর্কে জানা জরুরি।

১. তেলাপিয়া মাছের পোনা

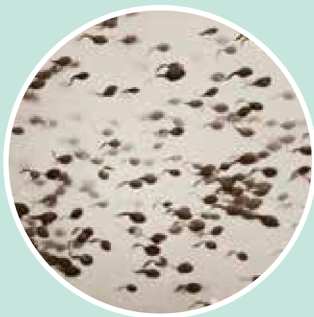

২. ব্যাঙের ডিম/বাচ্চা

৩. কার্প মাছের পোনা

৪. ভার্মি বা কেঁচো

৫. গুতুম মাছ

৬. প্রাণিকনা

## কুচিয়ার প্রাকৃতিক প্রজনন সম্পর্কিত তথ্য

কুচিয়ার প্রাকৃতিকভাবে তার আবাসস্থলে প্রজনন করে থাকে। চৈত্রের শেষ থেকে আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এরা প্রজনন করে। সাধারণত পুরুষ কুচিয়া স্ত্রী কুচিয়া অপেক্ষা আকারে বড় হয়। এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে কুচিয়ার ভোসোমাটিক ইনডেক্স সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে যা থেকে ধারণা করা যায় যে, কুচিয়া বছরে একবার মাত্র প্রজনন করে থাকে প্রজননের সময় এরা পানির উপরিতলের কাছাকাছি তলদেশের মাটিতে বিশেষভাবে ডিম পাড়ার উপযোগী বাসা তৈরি করে। এরূপ তৈরি বিশেষ বাসায় কুচিয়া ডিম দেয় এবং স্ত্রী কুচিয়া সার্বক্ষণিক ভাবে বাচ্চাদের পাহারা দেয়।

কুচিয়ার চাষ ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজননের জন্য বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এক্ষেত্রে সফলতার হার অত্যন্ত কম। কুচিয়া মাছের ডিমের সংখ্যা কম। কুচিয়ার ফ্যাকানডিটি মাত্র ১০০-৭০০ টি।

নিম্নে কুচিয়া মাছের প্রাপ্তি ডিমের সংখ্যা একটি পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

| গ্রুপ সাইজ (সেমি) | সংখ্যা (টি) | গড় শারীরিক ওজন (গ্রাম) | গড় ডিম্বাশয়ের ওজন (গ্রাম) | গড় ফেকানডিটি |
|---|---|---|---|---|
| ৫০-৫৫ | ১২ | ২৫৬.৩৩±৪৫.১৪ | ২১.৩২±৪.৪৮ | ৪৫৮.০±৩১.২২ |
| ৫৬-৬০ | ২১ | ৩২০.৫৭±২৪.২১ | ৩৪.৩৪±৩.৭৮ | ৬০১.২৩±৬৪.৪০ |
| ৬১-৬৫ | ২৭ | ৩৬৪.৬৩ ±৫১.২৫ | ৪৩.২৫±৯.১২ | ৭৮৭.২২±৯২.৩১ |
| ৬৬-৭০ | ০২ | ৪৯২.৫০ ±৫৩.২২ | ৫৫.৯০±০.৯৮ | ১১১৬.০±১১.৩১ |

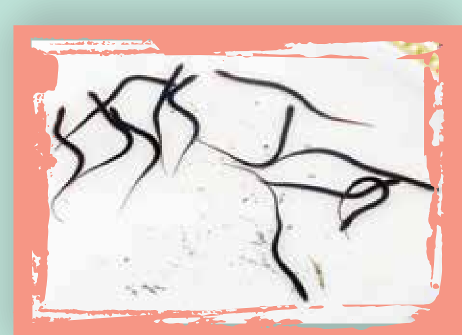

তবে যেহেতু কুচিয়া মাছের ডিমের সংখ্যা কম, সেহেতু কৃত্রিম প্রজননে প্রাপ্ত পোনা দিয়ে চাষ ব্যবস্থাপনার প্রাপ্যতা মিটানো সম্ভব নয়। প্রকৃতি থেকে পোনা সংগ্রহ করা খুবই কষ্টসাধ্য। তাই, খামারেই প্রাকৃতিক প্রজননের গুরুত্ব দিতে হবে এবং প্রাকৃতিক প্রজনন কিভাবে সহজতর করা যায় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আরোপ করা জরুরী।

## কুচিয়ার পোনা মজুদ ও মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

### পোনা মজুদ

প্রতি বর্গফুট আয়তনের পানিতে গড়ে ১০০ গ্রাম ওজনের ৫-৭টি হারে কুচিয়ার পোনা মজুদ করতে হবে। পোনা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উভয় উৎস হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। ডিচটির পরিবেশ পোনা ছাড়ার পূর্বে প্রকৃতির ধান ক্ষেতের আবাসস্থলের মত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কুচিয়ার খাদ্য গ্রহনের পরিমাণ নির্ভর করে মাছের মোট ওজন ও পরিবেশের তাপমাত্রার ওপর।

## মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

### কুচিয়া চাষে খাদ্য সরবরাহ

ক.
ছোট মাছ, মাছের পোনা,
গুতুম মাছ, কেঁচো, শামুক,
সিল্ক ওয়ার্ম পিইপি,
জলজ কীটপতঙ্গ,
শুটকী মাছ ইত্যাদি।

খ.
কুচিয়া জলজ কীটপতঙ্গ
বেশী খেতে পছন্দ করে।

গ.
কেঁচো ও ধান ক্ষেতের
এ্যাপেল শামুকও
এদের পছন্দের খাবার।

### খাদ্য প্রয়োগ

ক. জীবন্ত খাবার-হিসেবে কার্প মাছের রেণু বা ধানী পোনা ১৫ দিন পর পর মজুদ করতে হবে। আবার তেলাপিয়া মাছ মজুদ করা হলে পোনা উৎপাদন করবে যা কুচিয়ার খাবার হিসেবে ব্যবহার হবে।

খ. সম্পূরক খাদ্য-প্রতিদিন শারীরিক ওজনের ৩-৫% সম্পূরক খাবার দিতে হবে। ছোট অবস্থায় কুচিয়া চাষের উচ্চ হারে এবং বড় হলে নিম্নে হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। কুচিয়া মাছনিশাচর প্রাণী। এরা সাধারণত রাতে খাবার খায়। খাদ্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা ভাল।

গ. ছোট শুটকি মাছ জিআই তার দিয়ে মালা গেঁথে মাছ গুলো ২.৫ থেকে ৩.০ ফুট সাইজের প্লাস্টিক পাইপের মধ্যে পেঁচিয়ে তলায় রেখে দিতে হবে। দুদিন পরপর পরীক্ষণ করে  দেখতে হবে মাছ কতটুকু খেয়েছে। এরপর ৮০-৯০% খাবার শেষ হলে পূর্বের ন্যায় খাবার দিতে হবে।

ঘ. জীবিত আপেল শামুক খাদ্য হিসেবে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ঙ. শামুকের মাংস, সিল্ক ওয়ার্ম পিউপি, কেঁচো ইত্যাদি খাবার অল্প পানিতে ট্রেতে রেখে দিতে হবে।

চ. ফিশমিল ও অন্যান্য আমিষের উৎসের খাদ্য উপকরণ দিয়ে ৪০% আমিষ যুক্ত পিলেট খাদ্য তৈরি করে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কুচিয়া ও খাদ্যে অভ্যস্ত হলে পিলেট খাদ্য প্রয়োগ করেই এ মাছের চাষ করা সম্ভব হবে এবং চাষ সহজ হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, খাবার ট্রেতে করে সাজিয়ে দিলে ভাল। ট্রে টি কাঁদার উপর পানির নীচে রাখতে হবে।

কুচিয়া চাষে নিম্নরূপভাবে খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারেঃ

| খাবারের ধরণ | প্রয়োগ হার (দেহ ওজনের) | প্রয়োগ সময়কাল |
|---|---|---|
| জীবিত ধানী পোনা (রুই, কাতলা, মৃগেল অথবা তেলাপিয়া) | ৩.০% | ১৫ দিন অন্তর |
| শুটকী (ফিশমিল) | ১.০% | ১ দিন পর পর |
| শামুক/ঝিনুকের মাংস ও ছোট মৃত মাছ | ১.০% | ২ দিন পর পর |
| কেঁচো | ০.২০% | প্রতিদিন |
| গুতুম মাছ, ছোট শামুক, জলজ কীটপতঙ্গ | ১.০% | ২ দিন পর পর |

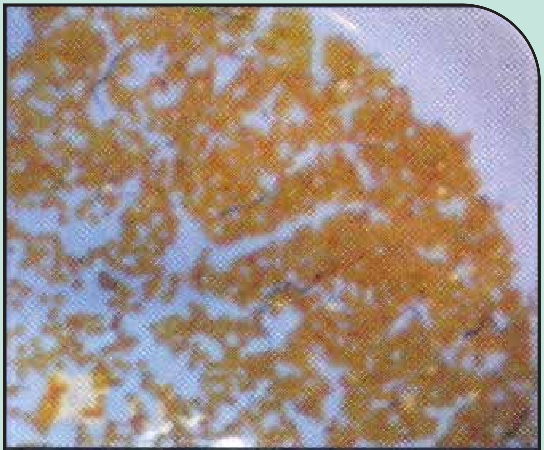

চিত্র ঃ ডিম থেকে প্রস্ফুটিত লার্ভি।

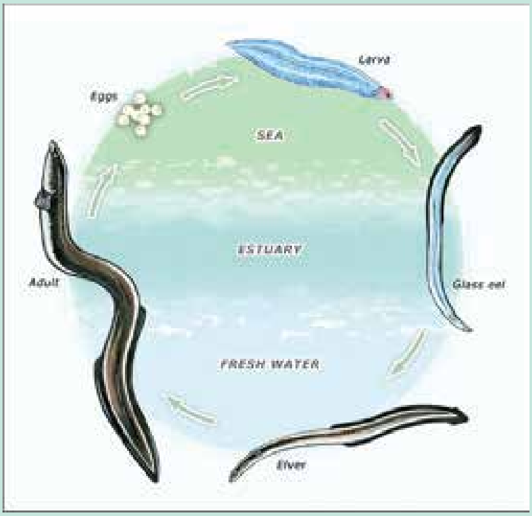


## কুচিয়ার ডিম ও লার্ভি ব্যবস্থাপনা

পরিপক্ক কুচিয়া সাধারণত বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত প্রজনন করে। তবে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস মুখ্য প্রজননকাল। প্রাকৃতিক প্রজননের জন্য নির্মিত ডিচের বকচরে কুচিয়া বিশেষ ধরনের গর্তবিশেষ আবাসস্থল তৈরি করে। যেখানে স্ত্রী কুচিয়া ডিম দেয় এবং পুরুষ কুচিয়ার স্পার্ম দ্বারা নিষিক্ত হয়। কুচিয়া মাছের ডিম আঠালো।

প্রাকৃতিক প্রজনন ব্যবস্থাপনায় করণীয়সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

ক. ডিমগুলোর আঠালো বৈশিষ্ট্য মাটির গর্তের মধ্যে দিয়ে উপরে আসার সময় মাটির সংস্পর্শে তা দূর হয়। ডিম গর্তের মধ্যে দিয়ে উপরে আসার সাথে সাথে গর্তের মুখ থেকে তা প্লাস্টিকের গামলা বা অনুরূপ পাত্রে সংগ্রহ করতে হবে।

খ. সংগৃহীত ডিম পরিষ্কার পানি দিয়ে কয়েকবার পরিষ্কার করতে হবে ও গামলার এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত পানি দিতে হবে।

গ. সংগৃহীত ডিমের অক্সিজেন চাহিদা বেশী থাকে। এ কারণে এয়ারেটর এর মাধ্যমে পাত্রের পানিতে অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. গামলায় আশ্রয়স্থল হিসেবে প্লাস্টিকের তৈরি চিকনাকৃতির ফিতা দিয়ে তৈরি একটি ঝাড়ু একপাশে স্থাপন করতে হবে।

ঙ. ডিম থেকে লার্ভিগুলো পরিস্ফুটিত হতে সাধারণত ৩ দিন সময় লাগে।

চ. লার্ভির ভিতরে ইয়ক স্যাক (Yolk sac) শোষিত হতে ৩-৪ দিন সময় লাগে।

ছ. এ প্রক্রিয়ায় সাধারণত ৯৫-৯৭% সফলতা পাওয়া যায়।

জ. ইয়ক স্যাক শোষিত হওয়ার পর লার্ভাগুলি খাদ্য গ্রহণ শুরু করে।

ঝ. প্রথম খাবার হিসেবে হাঁস বা মুরগীর সিদ্ধ ডিমের কুসুম ব্যবহার করা হয়।

ঞ. প্রতি এক লক্ষ পোনার জন্য হাঁস বা মুরগীর একটি ডিমের কুসুম সরবরাহ করতে হবে।

ট. প্রায় ৩ দিন পর থেকে খাবার হিসেবে জু-প্লাঙ্কটন ময়না (Moyna) ব্যবহার করতে হবে।

ঠ. তারপর আস্তে আস্তে ৪০% আমিষযুক্ত খাবারের সাথে অভ্যস্থ করতে হবে।

ড. নির্দিষ্ট সময়ের পর পোনা বড় গামলায় স্থানান্তর ও সর্বোপরি বসবাসযোগ্য সিস্টার্ন এ স্থানান্তর করতে হবে।

## ময়না উৎপাদন ব্যবস্থাপনা

এখন পর্যন্ত কুচিয়া মাছের সম্পূরক পিলেট খাবার ব্যবহার করা হয়নি। কারণ কুচিয়া মাছের জন্য ৪০% আমিষযুক্ত খাবারের দরকার হয়। কুচিয়া চাষ পদ্ধতি এখন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়নি সেজন্য সম্পূরক খাবারে কুচিয়া মাছকে অভ্যস্ত করানো হয়নি। তাই কুচিয়া মাছের নার্সারি খাবার হিসেবে পুকুরে উৎপাদিত জুওপ্লাংকটন ময়না খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। কারণ ময়না এদের প্রিয় খাদ্য।

ময়না উৎপাদনের করণীয়সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১. ময়না উৎপাদনের জন্য ১৫-২০ শতাংশ আয়তন বিশিষ্ট একটি ছোট পুকুর নির্বাচন করতে হবে।

২. পুকুরটি যথারীতি শুকাতে হবে।

৩. পুকুরের পাড় যথারীতি মেরামত করতে হবে।

৪. শতাংশে ১ (এক) কেজি চুন ব্যবহার করতে হবে।

৫. শতাংশে ২৫০ গ্রাম ইস্ট (Yeast) ও ১০০ গ্রাম চিটাগুড় ব্যবহার করতে হবে।

৬. শতাংশে ২০০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম ইউরিয়া পানিতে গুলে ছিটিয়ে দিতে হবে।

৭. ৩-৪ দিনের মধ্যে হালকা পানির রং ধারণ করবে এবং ময়না আধিক্যতায় প্লাংকটন জন্ম লাভ করবে।

৮. প্লাংকটন নেট দিয়ে তা সংগ্রহ করে কুচিয়ার পোনাকে খাওয়াতে হবে।

## একুয়াকালচার/ডিচ পদ্ধতিতে কুচিয়া চাষে আয়-ব্যয়ের হিসাব

### মডেল-১ঃ ২৮৮ বর্গফুট বিশিষ্ট ডিচের জন্য

উৎপাদন ও আয়ঃ (একটি উৎপাদন চক্রে আয়-ব্যয় হিসাব, ৬ মাসের জন্য)

১ মোট আয়তন = ২৮৮ বর্গফুট (দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট * প্রস্থ ১২ ফুট বিশিষ্ট ডিচের জন্য)

২ বকচর বাদে আয়তন = ১৯২ বর্গফুট

৩ অবমুক্ত পোনার (৩০-৮০ গ্রাম ওজনের) সংখ্যা = ১১৫২টি (৬টি/বর্গফুট)

৪ মৃত্যুহার (১০%) = ১১৫ টি

৫ উৎপাদিত কুচিয়ার সংখ্যা = ১০৩৭টি

৬ উৎপাদনঃ ১০৩৭ * ২৮০=৪২৩৩৬০ গ্রাম (২৯০ কেজি) (প্রতিটি মাছের কাঙ্খিত গড় ওজন ২৮০ গ্রাম হিসেবে)

৭ বিক্রয় = ২৯০ * কেজি ২৮০/- = ৮১,২০০/- (গড় দাম ২৮০ টাকা/কেজি)

৮ ১টি উৎপাদন চক্রে (৬ মাস মেয়াদে) মোট ব্যয়* = ৩০,৫০০ টাকা

৯ নীট লাভ = ৮১,২০০-৩০,৫০০= ৫০,৭০০/- (১ম চক্রে)

একজন সদস্য বছরে ২টি চক্রে (প্রতি চক্র ৬ মাস হিসেবে) সহজেই কুচিয়া চাষ করতে পারে। ১ম চক্রে স্থায়ী খরচ থাকায় ব্যয় কিছুটা বেশী হলেও ২য় চক্র হতে স্থায়ী খরচ লাগবে না। এভাবে স্থাপিত একটি ডিচে ৩ বছর পর্যন্ত কুচিয়া চাষ করা যায়।

### * ব্যয় বিভাজনঃ

প্রদর্শনী ডিচ স্থাপন- ১৮,০০০/-
পুনঃমজুদের জন্য কুচিয়া ক্রয়-৮,৫০০/- (অবমুক্তকরনের জন্য কুচিয়ার পোনা ক্রয়)
ডিচ ব্যবস্থাপনায় চলতি মুলধন-৪,০০০/- (যা ধাপে ধাপে প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ হতে পারে)
(কুচিয়ার খাবার ক্রয়, লেবার খরচ, আহরণ খরচ, চুন ও অন্যান্য)

মোট খরচঃ ৩০,৫০০/-

উল্লেখ্য, ডিচে কুচিয়ার পোনা ছাড়ার সংখ্যার উপর আয় নির্ভর করবে। তবে ডিচে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার থাকলে এবং ডিচে নিয়মিত ভার্মি/কেঁচো সরবরাহ করতে পারলে কুচিয়া চাষে খাদ্য খরচ অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

## মডেল-২ঃ ৩৬০ বর্গফুট বিশিষ্ট ডিচের জন্য

উৎপাদন ও আয়ঃ (একটি উৎপাদন চক্রে আয়-ব্যয় হিসাব, ৬ মাসের জন্য)

১ মোট আয়তন = ৩৬০ বর্গফুট (দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট * প্রস্থ ১২ ফুট বিশিষ্ট ডিচের জন্য)

২ বকচর বাদে আয়তন = ২৪০ বর্গফুট

৩ অবমুক্ত পোনার (৩০-৮০ গ্রাম ওজনের) সংখ্যা = ১৬৮০টি (৭টি/বর্গফুট)

৪ মৃত্যুহার (১০%) = ১৬৮ টি

৫ উৎপাদিত কুচিয়ার সংখ্যা = ১৫১২টি

৬ উৎপাদনঃ ১৫১২ * ২৮০ = ৪২৩৩৬০গ্রাম (৪২৩ কেজি), (প্রতিটি মাছের কাঙ্খিত গড় ওজন ২৮০গ্রাম হিসেবে)

৭ বিক্রয় = ৪২৩ কেজি * ২৮০/-= ১১৮,৪৪০/- (গড় দাম ২৮০ টাকা/কেজি)

৮ ১ টি উৎপাদন চক্রে (৬ মাস মেয়াদে) মোট ব্যয়* = ৪১,০০০ টাকা

৯ নীট লাভ = ১১৮,৪৪০-৪১,০০০ = ৭৭,৪৪০/- (১ম চক্রে)

একজন সদস্য বছরে ২টি চক্রে (প্রতি চক্র ৬ মাস হিসেবে) সহজেই কুচিয়া চাষ করতে পারে। ১ম চক্রে স্থায়ী খরচ থাকায় ব্যয় কিছুটা বেশী হলেও ২য় চক্র হতে স্থায়ী খরচ লাগবে না। এভাবে স্থাপিত একটি ডিচে ৩ বছর পর্যন্ত কুচিয়া চাষ করা যায়।

### * ব্যয় বিভাজনঃ

প্রদর্শনী ডিচ স্থাপন- ১৮,০০০/-
পুনঃমজুদের জন্য কুচিয়া ক্রয়- ১৫,৫০০/- (অবমুক্তকরনের জন্য কুচিয়ার পোনা ক্রয়)
ডিচ ব্যবস্থাপনায় চলতি মুলধন- ৭,৫০০/- (যা ধাপে ধাপে প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ হতে পারে)
(কুচিয়ার খাবার ক্রয়, লেবার খরচ, আহরণ খরচ, চুন, অন্যান্য)

মোট খরচঃ ৪১,০০০/-

তবে ডিচে কুচিয়ার পোনা ছাড়ার সংখ্যার উপর আয় নির্ভর করবে। তবে ডিচে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার থাকলে এবং ডিচে নিয়মিত ভার্মি/কেঁচো সরবরাহ করতে পারলে কুচিয়া চাষে খাদ্য খরচ অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

# কুচিয়ার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

রোগের সাধারণ লক্ষণ

১ পানির দূষিত পরিবেশ ও অতিরিক্ত মাছের মজুদ ঘনত্ব

২ অত্যধিক সার প্রয়োগ ও খাদ্য প্রয়োগ

৩ ডিচে/পুকুরের বাইরের পানির প্রবেশ

৪ ডিচে/পুকুরের তলার পচা জৈব পদার্থ ও বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি

৫ ডিচে/পুকুরের অন্য কোন কারণে রোগজীবাণু ঢুকে যেমন–ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি)

মাছের মড়ক এবং রোগের কারণের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। দেখা গেছে, পানির পরিবেশ খারাপ হলে মাছ মারা যায়। সেই তুলনায় মড়কের অন্যান্য কারণগুলো যেমন রোগ সৃষ্টিকারী প্রাণী, পুষ্টিকর পদার্থের অভাব ইত্যাদি অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ। তাই রোগ ব্যবস্থাপনায় মাছের পরিবেশ তথা পানির গুণাগুণ বজায় রাখা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

### রোগাক্রান্ত কুচিয়ার সাধারণ লক্ষণসমূহ

১. কুচিয়ার স্বাভাবিক চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়
২. কুচিয়া পানির ওপর ভেসে খাবি খায়
৩. দেহের স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে যায়। দেহের উপর লাল/কালো/সাদা দাগ পড়ে
৪. কুচিয়া কম খায় বা খাওয়া বন্ধ করে দেয়
৫. কুচিয়ার গায়ের পিচ্ছিল বিজল থাকে না
৬. কুচিয়া কোন কিছুর সাথে গা ঘসতে থাকে
৭. দেহ খসখসে হয়ে যায়
৮. দলবদ্ধ ভাবে চলাফেরা করে না, নিস্তেজ হয়ে পড়ে

ক্ষতরোগে আক্রান্ত কুচিয়া

### রোগ প্রতিরোধের সহজ পদক্ষেপ

১. ডিচ/চৌবাচ্চা নিয়মিত শুকিয়ে চুন দিতে হবে
২. চৌবচ্চায় নিয়মিত পানি পরিবর্তন করতে হবে
৩. কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত পোনা মজুদ করা যাবে না
৪. সারের পাশাপাশি ডিচে কিছু সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা ভাল
৫. কুচিয়াকে খুব বেশি হাত দিয়ে নাড়াচড়া করা যাবে না
৬. ক্ষতরোগ দেখা দিলে কুচিয়াকে লবন বা পটাশ পানিতে গোসল করিয়ে পুনরায় ছাড়তে হবে

**মনে রাখবেন, রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধই সবচেয়ে ভাল**

# কুচিয়া শুটকিকরণ কৌশল বা কুচিয়া সংরক্ষণ পদ্ধতি

১. পরিষ্কার মৃত কুচিয়া
২. প্লাষ্টিকের ঝুড়ি
৩. প্লাষ্টিকের ড্রাম
৪. শুকানোর জন্য বাঁশ ও কাঠের তৈরি ফ্রেম
৫. ফিনিশ পাউডার
৬. প্লাষ্টিকের বস্তা

**শুটকীকরণে প্রয়োজনীয় উপকরণ**

MARVEL

## কুচিয়া শুটকি ও সংরক্ষণ পদ্ধতির ধাপসমূহ

১. মৃত কুচিয়া সমূহ প্রথমে প্লাষ্টিকের বাস্কেটে রেখে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে

২. অতঃপর মৃত কুচিয়া সমূহ প্লাষ্টিকের বাস্কেট/ড্রামে রেখে ভালভাবে লবণ মাখাতে (২০ কেজি মৃত কুচিয়াতে প্রায় ৩ কেজি লবণ) হবে। এভাবে কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে।

৩. আবার প্লাষ্টিকের বাস্কেটে নিয়ে পুনরায় পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এবার প্লাষ্টিকের ড্রামের ভিতর ঝুড়িতে রেখে কুচিয়ায় পানি শুকিয়ে নিতে হবে (এভাবে ৩ ঘণ্টা রেখে দেয়া ভাল)।

৪. ইতোমধ্যে শুকানোর জন্য বাঁশ/কাঠের তৈরি ফ্রেম রৌদ্রোজ্জ্বল জায়গায় প্রস্তুত করে রাখতে হবে।

৫. এরপর সুচ ও সুতার ব্যবস্থা করতে হবে। সুচ দিয়ে প্রস্তুতকৃত কুচিয়ার কানকোর ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে ফুলের মালার মত তৈরি করে বাঁশ/কাঠের তৈরি ফ্রেমে শুকানোর জন্য বেধে রাখতে হবে ( এভাবে ৩-৪ দিন রেখে দিতে হবে)

৬. এই ৩-৪ দিন পর সুতা থেকে শুটকি কুচিয়া ছাড়িয়ে ফেলে প্লাষ্টিকের তৈরি বস্তা (পোল্ট্রির খাবারের বস্তা) রোদে বিছিয়ে রেখে তার উপর আবার ২-৩ দিন শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. তারপর চুড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করা হয় প্লাষ্টিকের বস্তায়। একটি বস্তায় ২৫-৩০ কেজি শুটকি কুচিয়া রাখা যায়। বস্তায় রাখার সময় ৩০ কেজি ধারণকৃত বস্তায় ৩০০ গ্রাম ফিনিশ পাউডার ও কয়েকটি ন্যাপথল গুড়ো করে শুটকি কুচিয়া মাখিয়ে বস্তাবন্দি করে রাখতে হবে।

৮. এভাবে শুটকিকৃত কুচিয়া ১-২ বছর সংরক্ষণ করে রাখা যায় কিন্তু মাসে অন্তত ১ বার রোদে শুকিয়ে আবার একই পরিমাণ ফিনিশ পাউডার ও ন্যাপথল মাখিয়ে রাখতে হবে।

৯. এভাবে ১০ কেজি পরিচ্ছন্ন মৃত কুচিয়া থেকে ৩ কেজি শুটকি পাওয়া যায়। ১ কেজি শুটকি বিক্রয় করা হয় ৪০০-৪৫০ টাকা, ১০ কেজি পরিচ্ছন্ন মৃত কুচিয়া ক্রয় করা হয় ৪০০ টাকায় আর তা থেকে বিক্রয় করা হয় ১২০০ টাকা। ১০ কেজি কুচিয়া শুটকি করতে কুচিয়া, অন্যান্য উপকরণ ও মজুরী বাবদ আনুমানিক ৫০০ টাকা খরচ হয় এবং ১০ কেজি কুচিয়া থেকে নীট ৭০০ টাকা লাভ হয়।

## উপসংহার

দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি দেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর এগিয়ে আসার কোন বিকল্প নেই। দেশের কৃষিজ উৎপাদন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে শুধুমাত্র আর্থিক বা কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ উপলব্ধি হতেই পিকেএসএফ-এর সহায়তায় উন্নয়ন সদস্যদের উপযুক্ত ও চাহিদামাফিক ঋণ সরবরাহ করার পাশাপাশি সংগঠিত সদস্যদের বিভিন্ন লাগসই প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তির কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে, যাতে করে প্রত্যেক সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি কাঙ্খিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি অর্জন করা যায়। এলক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর লিফট্ কর্মসূচির আওতায় হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র সকল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা 'ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)" কুচিয়া চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে, যা তাদের টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের মৎস্যখাতের সার্বিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।